كتاب الطهارة : তাহারাত পর্ব

1- عن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما حكم الصلاة بدون وضوء ؟
2- ما شرط صحة الصلاة على ضوء هذا الحديث ؟
3- ما هو العمل الذي يجب على المسلم القيام به قبل الشروع في الوضوء ؟
4- ان ماذا يقول الشخص عند البدء بالوضوء ليكون وضوؤه صحيحا كاملا ؟
5- ما أثر ترك تسمية الله على الوضوء؟ بين على ضوء قوله: "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"-
6- هل تجزئ الصلاة بعد وضوء تركت فيه التسمية عمدا أو نسيانا ؟
7- من الراوي لهذا الحديث عن رسول الله ﷺ ؟
8- هل يفهم من هذا الحديث أن ذكر اسم الله واجب الصحة الوضوء؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি **'কিতাবুত তাহারাত' (كتاب الطهارة) বা পবিত্রতা পর্বের** অন্তর্ভুক্ত একটি প্রসিদ্ধ ও মৌলিক হাদিস। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর *সুনানে আবু দাউদ* (হাদিস নং ১০১), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁর *সুনানে ইবনে মাজাহ* (হাদিস নং ৩৯৯) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য স্তরের।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

ইসলামে ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নামাজের জন্য ওজু এবং ওজুর আদব ও শর্তাবলি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ওজু কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার নাম নয়, বরং এর সাথে আল্লাহর নাম ও নিয়তের সম্পর্ক রয়েছে—এই আধ্যাত্মিক ও ফিকহি গুরুত্ব বোঝাতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) এই হাদিসটি ইরশাদ করেছেন। বিশেষ করে ওজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার গুরুত্ব আরোপ করাই এর মূল প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তির ওজু নেই, তার কোনো নামাজ নেই (নামাজ শুদ্ধ হবে না)। আর যে ব্যক্তি ওজু করার সময় আল্লাহর নাম নেয়নি (বিসমিল্লাহ বলেনি), তার ওজু নেই (ওজু পূর্ণাঙ্গ বা শুদ্ধ হবে না)।"

ব্যাখ্যা: এখানে দুটি অংশের আলোচনা রয়েছে।

প্রথমত, "লা সালাতা" (নামাজ নেই): অর্থাৎ ওজু ছাড়া নামাজ আদায় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটি সকল ফকিহদের সর্বসম্মত রায়।

দ্বিতীয়ত, "লা ওজুআ" (ওজু নেই): এখানে 'বিসমিল্লাহ' না বললে ওজু হবে না—এই অংশটি নিয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে (যেমন হাম্বলি মাযহাব) এটি ওজুর আবশ্যিক শর্ত বা ওয়াজিব, তাই বিসমিল্লাহ ছাড়া ওজু বাতিল। আবার জুমহুর বা অধিকাংশ ফকিহদের (হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি) মতে, এখানে 'নেই' দ্বারা 'পরিপূর্ণতা নেই' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ না বললে ওজু আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু ওজুর ফজিলত ও পূর্ণাঙ্গ সওয়াব অর্জিত হবে না।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিসের সারসংক্ষেপ হলো, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওজু ফরজ। আর ওজুকে সুন্নাহসম্মত ও পরিপূর্ণ করতে হলে শুরুতে অবশ্যই 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম বর্জন করা মুমিনের শানের খেলাফ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. ওজু ছাড়া নামাজের হুকুম কী? (ما حكم الصلاة بدون وضوء ؟)

উত্তর:

ইসলামি শরিয়তে নামাজ (সালাত) আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম এবং ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এই মহান ইবাদত পালনের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ওজু ছাড়া নামাজ আদায় করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং বাতিল। যদি কেউ ওজু না থাকা সত্ত্বেও নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না এবং তাকে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করে নামাজ আদায় করতে হবে।

দলিলসমূহ:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নামাজের জন্য পবিত্রতাকে ফরজ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং পাগুলো গিরা পর্যন্ত ধৌত করো। (সূরা মায়িদা: ৬)

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

অর্থ: পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল করা হয় না। (সহিহ মুসলিম: ২২৪)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের কারো নামাজ কবুল করবেন না যখন সে অপবিত্র হয়, যতক্ষণ না সে ওজু করে। (সহিহ বুখারি: ৬৯৫৪)

ফিকহি বিশ্লেষণ:

সমস্ত ফকিহ ও ইমামদের ঐকমত্যে (ইজমা), ওজু বা পবিত্রতা নামাজের জন্য 'শর্ত'। শর্ত হলো এমন বিষয় যা ইবাদতের মূল কাঠামোর বাইরে কিন্তু তা না থাকলে ইবাদত শুদ্ধ হয় না। জেনেশুনে ওজু ছাড়া নামাজ পড়া কবিরা গুনাহ। এমনকি ফিকাহবিদদের একটি দল মনে করেন, যদি কেউ পবিত্রতাকে তোয়াক্কা না করে বা একে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ওজু ছাড়া নামাজ পড়ে, তবে তা কুফরি পর্যন্ত গড়াতে পারে (নাউজুবিল্লাহ)। তবে ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃত ওজু ছাড়া নামাজ পড়লে গুনাহ হবে না, কিন্তু স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ওজু করে সেই নামাজ কাজা আদায় করা ওয়াজিব।

---

২. এই হাদিসের আলোকে নামাজের বিশুদ্ধতার শর্ত কী? (ما شرط صحة الصلاة على ضوء هذا الحديث ؟)

উত্তর:

আলোচ্য হাদিসটির প্রথমাংশ "لا صلاة لمن لا وضوء له" (যে ব্যক্তির ওজু নেই, তার কোনো নামাজ নেই)—এই বাক্যের ওপর ভিত্তি করে নামাজের বিশুদ্ধতার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো 'ওজু' বা পবিত্রতা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'তাহারাত' (الطهارة) বলা হয়। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মুসল্লির শরীর, পোশাক এবং নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া আবশ্যক, যার মধ্যে 'হাদাস' (অদৃশ্য নাপাকি) থেকে পবিত্র হওয়া তথা ওজু করা বা প্রয়োজনে গোসল করা প্রধানতম শর্ত।

আরবি দলিল:

হাদিসটিতে সুস্পষ্টভাবে 'লা' (لا) বা নেতিবাচক অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা 'নাফি আল-জিনস' (نفي الجنس) বা সত্তাকে নাকচ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ওজু ছাড়া নামাজের কোনো অস্তিত্বই শরিয়তে নেই।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

অর্থ: নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা। (সুনানে আবু দাউদ: ৬১)

চাবি ছাড়া যেমন তালা খোলা যায় না, তেমনি পবিত্রতা বা ওজু ছাড়া নামাজে প্রবেশ করা যায় না।

ফিকহি বিশ্লেষণ:

উসুল আল-ফিকহের নীতি অনুযায়ী, যখন কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন তা সেই ইবাদতের বিশুদ্ধতাকে নাকচ করে দেয়। এখানে 'লা সালাতা' মানে হলো নামাজ বাতিল। ইমাম নববি (রহ.) বলেন, "মুসলমানদের ইজমা (ঐকমত্য) হলো যে, পানি বা মাটি (তায়াম্মুম) দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নামাজের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত।"

শর্ত এবং রুকনের মধ্যে পার্থক্য হলো, রুকন ইবাদতের ভেতরের অংশ (যেমন রুকু, সিজদা), আর শর্ত হলো বাইরের প্রস্তুতি। ওজু নামাজের বাইরের প্রস্তুতি হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিসের আলোকে বোঝা যায়, ওজু কেবল একটি শারীরিক পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং এটি আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য অপরিহার্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি। যদি কেউ ওজু ছাড়া হাজার বারও সিজদা করে, তবু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা নামাজ বলে গণ্য হবে না। সুতরাং, নামাজের 'সিহ্হত' বা বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে ওজুর ওপর নির্ভরশীল।

---

৩. ওজু শুরু করার আগে একজন মুসলিমের কী কাজ করা উচিত? (ما هو العمل الذي يجب على المسلم القيام به قبل الشروع في الوضوء ؟)

উত্তর:

ওজু একটি মহৎ ইবাদত এবং নামাজের চাবি। তাই ওজু শুরু করার পূর্বে একজন মুসলিমের ওপর কিছু করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয় রয়েছে যা তার ওজুকে পূর্ণাঙ্গ ও বরকতময় করে তোলে। ওজু শুরু করার আগে একজন মুসলিমের প্রধান কাজগুলো হলো:

১. ইস্তিঞ্জা বা পবিত্রতা অর্জন: যদি মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন থাকে, তবে প্রথমে ইস্তিঞ্জা করে শরীরকে নাপাকি থেকে পবিত্র করতে হবে।

২. মিসওয়াক করা: ওজুর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

অর্থ: যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদের প্রত্যেক ওজুর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

৩. নিয়ত (Intention): ওজু শুরু করার আগে মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সংকল্প (নিয়ত) করা আবশ্যক বা সুন্নাহ (মাযহাবভেদে)। হাদিসে এসেছে:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ: নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (সহিহ বুখারি: ১)

৪. বিসমিল্লাহ পাঠ: ওজু শুরু করার ঠিক আগ মুহূর্তে 'বিসমিল্লাহ' বলা। এটি আলোচ্য হাদিসের মূল শিক্ষা।

ফিকহি বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব:

মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোনো ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয় না। ওজুর পূর্বে এই কাজগুলো মুমিনকে দুনিয়াবী চিন্তা থেকে মুক্ত করে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করে। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবে ওজুর জন্য নিয়ত করা ফরজ। হানাফি মাযহাবে এটি সুন্নাহ। তবে সর্বসম্মতিক্রমে, ওজু শুরুর আগে ইস্তিঞ্জা সেরে নেওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া ওজুর পাত্র বা পানির স্থানটি পবিত্র কি না তা নিশ্চিত করাও জরুরি।

সুতরাং, ওজু শুরু করার আগে একজন মুসলিমের উচিত মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করা, মনে মনে ইবাদতের নিয়ত করা এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ওজুর মূল কাজ শুরু করা। এটি ওজুর নূর বা জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করে।

---

৪. ওজু সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য ওজু শুরুর সময় কী বলতে হয়? (ان ماذا يقول الشخص عند البدء بالوضوء ليكون وضوؤه صحيحا كاملا ؟)

উত্তরঃ

ওজুকে শরিয়তসম্মত, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ (কামিল) রূপে সম্পাদন করার জন্য ওজুর শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। হাদিসে একে 'তাসমিয়া' বলা হয়েছে। আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওজুর শুরুতে আল্লাহর নাম নেয় না, তার ওজু নেই।" এই নির্দেশের ওপর আমল করার জন্য ওজুর শুরুতে "বিসমিল্লাহ" (بِسْمِ ٱللَّهِ) অথবা পূর্ণাঙ্গরূপে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" (بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ) বলা উচিত।

আরবি দলিলঃ

রাসুলুল্লাহ (সা.) ওজু শুরুর দোয়া সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন:

تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর নামে ওজু করো। (সুনানে নাসায়ি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ওজুর শুরুতে বলতে হয়:

بِسْمِ ٱللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। (তাবারানি)

বিশদ ব্যাখ্যাঃ

ওজু সঠিক হওয়ার জন্য এবং এর পূর্ণ সওয়াব লাভের জন্য এই 'তাসমিয়া' পাঠ করা জরুরি। ফকিহদের মতে, ওজুর শুরুতে মুখে উচ্চারণ করে 'বিসমিল্লাহ' বলা উত্তম। যদি কেউ এমন স্থানে থাকে যেখানে মুখে আল্লাহর নাম নেওয়া বেয়াদবি (যেমন টয়লেটের ভেতরে), তবে সে মনে মনে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না।

হাম্বলি মাযহাবের মতে, ওজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেয়, তবে তার ওজু হবে না। হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের মতে, এটি সুন্নাহ মুয়াক্কাদা। অর্থাৎ এটি বললে ওজু পূর্ণাঙ্গ হয় এবং অনেক সওয়াব পাওয়া যায়, আর না বললে ওজু আদায় হবে কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হাদিসের "লা ওজুআ" (ওজু নেই) শব্দটির দ্বারা হানাফি ও অন্য ইমামগণ 'কামিল বা পূর্ণাঙ্গ ওজু নেই' অর্থ গ্রহণ করেছেন।

অতএব, একজন মুমিনের উচিত সতর্কতাস্বরূপ ও অধিক সওয়াবের আশায় ওজুর শুরুতে স্পষ্ট উচ্চারণে 'বিসমিল্লাহ' বলা, যাতে তার ওজু নিঃসন্দেহে কবুল হয় এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ হয়।

৫. ওজুতে আল্লাহর নাম (তাসমিয়া) ত্যাগ করার প্রভাব কী? "যার ওজুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তার ওজু নেই"—এই বাণীর আলোকে বর্ণনা করো। (ما أثر ترك تسمية الله على الوضوء؟ بين على ضوء قوله: "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه")

উত্তর:

ওজুতে 'তাসমিয়া' বা 'বিসমিল্লাহ' ত্যাগ করার প্রভাব এবং হাদিসের " ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " (যে আল্লাহর নাম নেয়নি তার ওজু নেই)—এই অংশের ব্যাখ্যা নিয়ে ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে। এই অংশটির প্রভাব দুই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়: **১. ওজুর বৈধতা (Validity) এবং ২. ওজুর পূর্ণাঙ্গতা (Perfection)।**

১. হাম্বলি মাযহাব ও জাহেরি সম্প্রদায়ের মত:

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং কিছু হাদিস বিশারদের মতে, হাদিসের "লা" (لا) শব্দটি 'নাফি আল-সিহহাত' (نفي الصحة) বা বিশুদ্ধতাকে নাকচ করার জন্য এসেছে। অর্থাৎ, ওজুর শুরুতে আল্লাহর নাম না নিলে ওজুটি শরিয়তের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের মতে, তাসমিয়া পাঠ করা ওজুর একটি ওয়াজিব বা শর্ত। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবে তার ওজু হবে না এবং সেই ওজু দিয়ে নামাজও হবে না। তাদের দলিল হলো হাদিসের বাহ্যিক অর্থ যা সরাসরি ওজুকে নাকচ করছে।

২. হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাবের (জুমহুর) মত:

অধিকাংশ ফকিহদের মতে, এখানে "লা" শব্দটি 'নাফি আল-কামাল' (نفي الكمال) বা পূর্ণাঙ্গতাকে নাকচ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ না বললে ওজু বাতিল হবে না, বরং ওজুটি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হবে। তাদের যুক্তি হলো, পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৬ নং আয়াতে ওজুর ফরজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে (মুখ ধোয়া, হাত ধোয়া, মাথা মাসেহ ও পা ধোয়া), সেখানে 'বিসমিল্লাহ' বলাকে ফরজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। তাই হাদিসটিকে কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের মতে,

তাসমিয়া ত্যাগ করলে ওজু মাকরুহ বা সুন্নাহ পরিপন্থী হবে, কিন্তু ওজু বাতিল হবে না এবং তা দিয়ে নামাজ পড়া যাবে।

উপসংহার:

তাসমিয়া ত্যাগ করার প্রভাব হলো ওজুর সওয়াব কমে যাওয়া এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বর্জন করা। যদিও জুমহুর ফকিহদের মতে ওজু হয়ে যাবে, কিন্তু হাদিসের কঠোর ভাষার কারণে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা কোনোভাবেই উচিত নয়। এটি মুমিনের অসতর্কতা ও উদাসীনতার পরিচায়ক।

---

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত বিসমিল্লাহ ত্যাগ করা ওজু দিয়ে নামাজ আদায় কি যথেষ্ট হবে? (هل تجزئ الصلاة بعد وضوء تركت فيه التسمية عمدا أو نسيانا ؟)

উত্তর:

এই প্রশ্নটি পূর্ববর্তী প্রশ্নের ফিকহি মতভেদের ওপর নির্ভরশীল। ওজুতে বিসমিল্লাহ ত্যাগ করা দুইভাবে হতে পারে: ইচ্ছাকৃতভাবে (Amadan) অথবা ভুলবশত (Nisyanan)। উভয় ক্ষেত্রে নামাজ শুদ্ধ হবে কি না, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ভুলবশত (Nisyanan) বিসমিল্লাহ ত্যাগ করলে:

এ বিষয়ে প্রায় সকল ফকিহ একমত যে, যদি কেউ ওজু করার সময় ভুলবশত বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে তার ওজু শুদ্ধ হবে এবং সেই ওজু দ্বারা নামাজ আদায় করলে নামাজও পরিপূর্ণ হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যা করতে তারা বাধ্য হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২০৪৩)

এমনকি হাম্বলি মাযহাবেও (যারা বিসমিল্লাহকে ওয়াজিব মনে করেন), ভুলবশত ছুটে গেলে ওজু এবং নামাজ উভয়টিই শুদ্ধ বলে গণ্য হয়।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে (Amadan) বিসমিল্লাহ ত্যাগ করলেঃ

- হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি মাযহাব অনুসারেঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বললেও ওজু শুদ্ধ হবে, কারণ তাদের মতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাহ, ফরজ নয়। তাই এই ওজু দিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হয়ে যাবে (তাজজিউ - تجزئ)। তবে সুন্নাহ তরক করার কারণে ব্যক্তি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাজটি অনুচিত হবে।
- হাম্বলি মাযহাব অনুসারেঃ তাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, ওজুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তাই কেউ যদি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলে, তবে তার ওজু বাতিল হবে। আর যেহেতু ওজু বাতিল, তাই সেই ওজু দিয়ে পড়া নামাজও বাতিল হবে এবং তা পুনরায় আদায় করা আবশ্যক হবে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তঃ

সতর্কতামূলক মত হলো, নামাজ নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হওয়ার জন্য এবং মতভেদ থেকে বাঁচতে ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা অপরিহার্য। তবে জুমহুর ফকিহদের রায়ের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, বিসমিল্লাহ বাদ পড়লেও (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) নামাজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু মুমিন হিসেবে আমাদের হাদিসের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বদা বিসমিল্লাহ পাঠ করা উচিত।

---

৭. রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে এই হাদিসের বর্ণনাকারী কে? (من الراوي لهذا الحديث عن رسول الله ﷺ ؟)

উত্তরঃ

আলোচ্য হাদিসটি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন জলিলুল কদর সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)।

পরিচয়ঃ

তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হলো তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখর আদ্-দাউসি (রা.)। ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল আবদুশ শামস। তিনি ইয়েমেনের দাওস গোত্রের লোক ছিলেন। সপ্তম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন।

কুনিয়াত বা উপনাম:

তাঁকে 'আবু হুরায়রা' (বিড়াল ছানার পিতা) বলা হয়। কারণ তিনি বিড়াল খুব ভালোবাসতেন। একদিন তিনি জামার আস্তিনে বিড়াল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আদর করে 'ইয়া আবা হুরায়রা' বলে ডাক দেন। এরপর থেকে এই নামেই তিনি জগতবিখ্যাত হন।

মর্যাদা ও হাদিস বর্ণনায় অবদান:

তিনি ছিলেন 'আসহাবে সুফফা'র অন্তর্ভুক্ত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি নিজের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। একবার তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা নিয়ে অভিযোগ করলে, নবীজি (সা.) তাঁর চাদর বিছিয়ে দোয়া করে দেন, এরপর তিনি আর কোনো হাদিস ভোলেননি।

তিনি সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী (মুকাসসিরিন)। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি। ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, আটশতাধিক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫৭ বা ৫৯ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাদিস শাস্ত্র ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান মুসলিম উম্মাহর কাছে চিরস্মরণীয়।

---

৮. এই হাদিস থেকে কি বোঝা যায় যে আল্লাহর নাম নেওয়া ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াজিব? (هل يفهم من هذا الحديث أن ذكر اسم الله واجب الصحة الوضوء؟)

উত্তর:

এই প্রশ্নটি হাদিসের 'দালালাত' বা নির্দেশনার গভীরতা নিয়ে। হাদিসের " ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" অংশটি থেকে ওজুতে আল্লাহর নাম নেওয়া

(তাসমিয়া) ওয়াজিব কি না, তা বোঝার জন্য উসুল আল-ফিকহের প্রয়োগ প্রয়োজন।

ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে যুক্তি:

হাদিসের বাহ্যিক শব্দবিন্যাস (Zahir al-Hadith) জোরালোভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহর নাম নেওয়া ওয়াজিব। 'লা' (لا) শব্দটি যখন কোনো ইসিম বা বিশেষ্যের পূর্বে আসে, তখন তা সেই জিনিসের সত্তাকেই নাকচ করে। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ ছাড়া ওজুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ সাধারণত পালন করা ওয়াজিব বা ফরজ হয়, যতক্ষণ না অন্য কোনো দলিল তা শিথিল করে। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একটি মত অনুযায়ী, এই হাদিস প্রমাণ করে যে তাসমিয়া ওজুর শুদ্ধতার জন্য শর্ত বা ওয়াজিব।

ওয়াজিব না হওয়ার (সুন্নাহ হওয়ার) পক্ষে যুক্তি:

অধিকাংশ ফকিহ (হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি) মনে করেন, এই হাদিস থেকে 'ওয়াজিব' প্রমাণিত হয় না, বরং এটি সুন্নাহ বা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ। তাদের যুক্তিগুলো হলো:

১. কুরআনের সাথে সমন্বয়: কুরআনের আয়াত (সূরা মায়িদা: ৬) দ্বারা ওজুর ফরজগুলো নির্ধারিত। সেখানে তাসমিয়া নেই। হাদিস দ্বারা কুরআনের অকাট্য বিধানের ওপর অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা যায় না (হানাফি উসুল অনুযায়ী)।

২. অন্যান্য হাদিস: এক বেদুইনকে রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের নিয়ম শেখাতে গিয়ে ওজুর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে কঠোরভাবে বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ করেননি।

৩. ভাষাগত ব্যাখ্যা: এখানে 'লা ওজুআ' মানে 'পরিপূর্ণ ওজু নেই'। যেমন বলা হয় "লা সালাতা লি জারিল মাসজিদ ইল্লা ফিল মাসজিদ" (মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ মসজিদ ছাড়া হয় না)। এর মানে এই নয় যে ঘরে পড়লে নামাজ হবে না, বরং মসজিদের জামাতে পড়ার মতো পূর্ণ সওয়াব হবে না।

সিদ্ধান্ত:

যদিও হাদিসের শাব্দিক অর্থ ওয়াজিবের দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু সামগ্রিক দলিলাদি ও উসুলের আলোকে জমহুর ফকিহগণের মতটিই অধিক শক্তিশালী যে, ওজুতে আল্লাহর নাম নেওয়া 'সুন্নাহ মুয়াক্কাদা' (গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ), কিন্তু 'ওয়াজিব' বা 'শর্ত' নয় যা ছাড়া ওজু বাতিল হয়ে যাবে। তবে হাদিসের ধমকি বা সতর্কবাণী থেকে বোঝা যায়, এটি সাধারণ কোনো মুস্তাহাব নয়, বরং ওজুর পূর্ণতার জন্য এটি অপরিহার্য একটি আমল যা ত্যাগ করা উচিত নয়।

---

2 - حدثنا ابن أبي دارد قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار قال كنت مع رسول الله ﷺ حين نزلت أية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- **اشرح بالتفصيل كيف كانت صفة التيمم التي قام بها الصحابة عند نزول أية التيم، معتمدا على ما ورد في هذا الحديث –**
2- **بين دلالة قول عمار رضي الله عنه "فضربنا ضربة واحدة للوجه" وما يفهم منها في حكم تعدد الضربات –**
3- **وضح الأعضاء التي شملها التيمم المذكور في هذه الرواية وما هو الحد الذي وصل إليه المسح على اليدين –**
4- **فسر الجملة "ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا" وبين كيفية المسح من خلالها –**
5- **ما الفائدة الأصولية والفقهية من ذكر الصحابي لتوقف الحديث حين نزلت أية التيمم ؟**
6- **بين ما إذا كانت صفة التيمم في هذا الحديث تتفق مع الأحاديث الصحيحة الأخرى المتأخرة - وكيف وجه العلماء هذا الاختلاف ؟**
7- **ما هو المنهج الذي اتبعه عمار (رض) في عرض صفة التيمم؟ وما الذي يدل على حرص الصحابة على نقل العلم ؟**
8- **اشرح الحكم الفقهي لوجوب ضربتين للتيمم كما يدل عليه هذا النص، وماذا قال الفقهاء في العمل به؟**

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

حدثنا ابن أبي دارد قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار قال: كنت مع رسول الله ﷺ حين نزلت أية التيمم، فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি **'কিতাবুত তাহারাত' (كتاب الطهارة) বা পবিত্রতা পর্বের** তায়াম্মুম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর *সুনানে আবু দাউদ* গ্রন্থে এবং ইমাম তাবারানি (রহ.) তাঁর *আল-মুজামুল কাবির* গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এছাড়াও ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর *সুনানুল কুবরা* গ্রন্থে এই রেওয়াতটি উল্লেখ করেছেন। এটি তায়াম্মুমের প্রাথমিক যুগের বিধান বা সাহাবিদের ইজতিহাদ সম্পর্কিত একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গণ্য।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মদিনার জীবনে কোনো এক সফরে (বনু মুস্তালিক যুদ্ধ বা অন্য সফরে) যখন পানির অভাব দেখা দেয় এবং ফজরের নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদির জন্য সহজ করে 'তায়াম্মুম' বা মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের আয়াত নাজিল করেন। আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে তায়াম্মুম করেছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে তাঁদের আমল কেমন ছিল, তা বর্ণনা করাই এই হাদিসের মূল প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: ইবনে আবি দাউদ (রহ.) ... হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "তায়াম্মুমের আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা (মাটিতে) একবার হাত মারলাম এবং তা দিয়ে চেহারা মাসেহ করলাম। এরপর আমরা হাতের জন্য (মাটিতে)

আরেকবার হাত মারলাম এবং তা দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত হাতের পিঠ ও ভেতরের অংশ মাসেহ করলাম।"

ব্যাখ্যা: এই হাদিসে তায়াম্মুমের দুটি বিশেষ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন।

প্রথমত, কাঁধ পর্যন্ত হাত মাসেহ: এখানে 'ইলাল মানাকিব' (কাঁধ পর্যন্ত) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথচ প্রসিদ্ধ ফতোয়া হলো কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করা। মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে, এটি ছিল তায়াম্মুমের নির্দেশ আসার পর সাহাবিদের নিজস্ব বুঝ বা ইজতিহাদ। তাঁরা মনে করেছিলেন, যেমন অজুর ক্ষেত্রে কনুই পর্যন্ত ধুতে হয়, তায়াম্মুম যেহেতু মাটির অজু, তাই এখানে হয়তো পুরো হাত (কাঁধ পর্যন্ত) মাসেহ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দুইবার হাত মারা: হাদিসে চেহারার জন্য একবার এবং হাতের জন্য আরেকবার মাটিতে হাত মারার কথা বলা হয়েছে, যা হানাফি মাযহাবসহ জমহুর ফকিহদের 'দুই জরব' (দুইবার হাত মারা) এর মতকে শক্তিশালী করে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি বিধান পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করেছে। তায়াম্মুমের শুরুতে সাহাবিরা কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করলেও পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে তা 'কনুই পর্যন্ত' (হানাফি মতে) অথবা 'কবজি পর্যন্ত' (অন্য মতে) সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই হাদিসটি ফিকহি বিবর্তনের একটি অনন্য দলিল।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে তায়াম্মুমের আয়াত নাজিলের সময় সাহাবিদের তায়াম্মুমের পদ্ধতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো। (اشرح بالتفصيل كيف كانت صفة التيمم التي قام بها الصحابة عند نزول أية التيم، معتمدا على ما ورد في هذا الحديث)

উত্তর:

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর এই হাদিসটি তায়াম্মুমের বিধান নাজিল হওয়ার অব্যবহিত পরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে। এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে সেই সময়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে পদ্ধতিতে তায়াম্মুম করেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. মাটির ব্যবহার: সাহাবিরা পবিত্র মাটি বা ভূ-পৃষ্ঠের ওপর হাত মেরে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অর্থ: তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। (সূরা নিসা: ৪৩)

২. চেহারার জন্য পৃথক আঘাত (জরব): হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, সাহাবিরা প্রথমে চেহারার জন্য মাটিতে হাত মেরেছিলেন। বর্ণনায় বলা হয়েছে " فضربنا ضربة واحدة للوجه"। অর্থাৎ, তাঁরা দুই হাতের তালু মাটিতে মেরে তা দিয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, চেহারার মাসেহ তায়াম্মুমের প্রথম ফরজ এবং এর জন্য পৃথকভাবে মাটিতে হাত মারা আবশ্যক।

৩. হাতের জন্য দ্বিতীয় আঘাত: চেহারার পর তাঁরা হাতের জন্য পুনরায় মাটিতে হাত মেরেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, সেই সময় তাঁরা একই আঘাতে চেহারা ও হাত মাসেহ করেননি, বরং দুই অঙ্গের জন্য দুইবার মাটি স্পর্শ করেছিলেন।

৪. কাঁধ পর্যন্ত হাত মাসেহ করা: এই হাদিসের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দিক হলো হাতের সীমা। বর্তমানে আমরা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করি, কিন্তু আয়াত নাজিলের শুরুতে সাহাবিরা "إلى المنكبين" বা কাঁধ পর্যন্ত হাত মাসেহ করেছিলেন। এর কারণ ছিল 'কিয়াস' বা তুলনা। তাঁরা অজুর সাথে তুলনা করে ভেবেছিলেন, যেহেতু অজুতে কনুই পর্যন্ত ধুতে হয় এবং তায়াম্মুম হলো অজুর বিকল্প, তাই এখানে পবিত্রতা নিশ্চিত করতে পুরো হাত তথা কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করাই শ্রেয়। তাঁরা হাতের পিঠ (জহির) এবং হাতের ভেতর বা পেট (বাতিন) উভয় অংশই মাসেহ করেছিলেন।

পর্যালোচনা: এটি ছিল সাহাবিদের প্রাথমিক আমল। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এই পদ্ধতি সংশোধন করে দেন। সহিহ বুখারির অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আম্মার (রা.)-কে কনুই বা কবজি পর্যন্ত মাসেহ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

তবে এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, সাহাবিরা আল্লাহর হুকুম পালনে কতটা সতর্ক ও অত্যুৎসাহী ছিলেন যে, তাঁরা সতর্কতাবশত পুরো হাতই মাসেহ করেছিলেন।

---

২. আম্মার (রা.)-এর উক্তি "আমরা চেহারার জন্য একটি আঘাত করলাম"—এর তাৎপর্য কী এবং এর দ্বারা একাধিক আঘাতের (জরব) হুকুম সম্পর্কে কী বোঝা যায়? ("فضربنا ضربة واحدة للوجه" عنه الله رضي عمار قول دلالة بين وما يفهم منها في حكم تعدد الضربات)

উত্তর:

হযরত আম্মার (রা.)-এর উক্তি "فضربنا ضربة واحدة للوجه" (অতঃপর আমরা চেহারার জন্য একটি আঘাত করলাম) ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সমাধানের দলিল। এর তাৎপর্য এবং একাধিক আঘাতের হুকুম নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

শব্দগত বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য:

এখানে "দরবাতান ওয়াহিদাহ" (একটি আঘাত) কথাটি বিশেষভাবে চেহারার (Wajh) সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এবং পরবর্তীতে বলা হয়েছে " ثم ضربنا ضربة لليدين" (অতঃপর আমরা হাতের জন্য আরেকটি আঘাত করলাম)। 'সুম্মা' (অতঃপর) অব্যয়টি ধারাবাহিকতা ও ভিন্নতা নির্দেশ করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম চেহারা এবং হাতের জন্য একই মাটি বা একবার হাত মারাকে যথেষ্ট মনে করেননি। বরং তাঁরা চেহারার জন্য একবার এবং হাতের জন্য আরেকবার—মোট দুইবার মাটিতে হাত মেরেছেন।

একাধিক আঘাতের (তাআদ্দুদুদ দারবাত) হুকুম:

এই হাদিসটি হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের ফকিহদের জন্য শক্তিশালী দলিল, যারা বলেন যে তায়াম্মুমে দুটি 'জরব' বা আঘাত ওয়াজিব।

- **প্রথম জরব:** চেহারার জন্য।
- **দ্বিতীয় জরব:** দুই হাতের জন্য।

তাদের যুক্তি হলো, তায়াম্মুম যেহেতু অজুর স্থলাভিষিক্ত, আর অজুতে যেমন চেহারা ও হাত ধোয়ার জন্য আলাদা পানি নেওয়া হয় বা আলাদাভাবে ধোয়া হয়, তায়াম্মুমেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আঘাত প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে এসেছে:

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

অর্থ: তায়াম্মুম হলো দুই আঘাত: এক আঘাত চেহারার জন্য এবং এক আঘাত দুই হাতের কনুই পর্যন্ত। (দারা কুতনি, হাকিম)

যদিও কোনো কোনো ফকিহ (যেমন ইমাম আহমদ ও আহলে হাদিস) বুখারির অন্য একটি বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে বলেন যে 'এক আঘাতই যথেষ্ট', কিন্তু আলোচ্য হাদিসটি এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর আমল প্রমাণ করে যে, সাহাবিদের মধ্যে দুই আঘাতের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং এটি অধিক সতর্কতামূলক। বিশেষ করে "আমরা চেহারার জন্য একটি আঘাত করলাম"—এই বাক্যটি প্রমাণ করে যে, হাতের আঘাতটি এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি কাজ ছিল।

---

৩. এই বর্ণনায় উল্লিখিত তায়াম্মুমের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গগুলো কী কী এবং হাত মাসেহ করার সীমা কতটুকু ছিল? (وضح الأعضاء التي شملها التيمم المذكور في هذه الرواية وما هو الحد الذي وصل إليه المسح على اليدين)

উত্তর:

আলোচ্য হাদিসে তায়াম্মুমের যে পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে তায়াম্মুমের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গগুলো এবং তাদের সীমানা বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ও বিস্তৃত ছিল।

তায়াম্মুমের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গসমূহ:

১. চেহারা (আল-ওয়াজহ): হাদিসে প্রথম অঙ্গ হিসেবে চেহারার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনের আয়াত "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ" (তোমরা তোমাদের চেহারা মাসেহ করো) এর অনুসরণে সাহাবিরা পুরো মুখমণ্ডল মাসেহ করেছিলেন। মুখমণ্ডল

বলতে কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত স্থানকে বোঝায়।

২. দুই হাত (আল-ইয়াদাইন): দ্বিতীয় অঙ্গ হিসেবে দুই হাতের উল্লেখ রয়েছে।

হাত মাসেহ করার সীমা:

এই বর্ণনায় হাত মাসেহ করার সীমা নিয়ে একটি বিশেষ উল্লেখ রয়েছে যা সাধারণ মাসআলা থেকে ভিন্ন। হাদিসে বলা হয়েছে: "إِلَى الْمَنَاكِبِ" (কাঁধ পর্যন্ত)।

সাধারণত আমরা জানি, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাত কনুই পর্যন্ত (হানাফি মতে) অথবা কবজি পর্যন্ত (অন্য মতে) মাসেহ করতে হয়। কিন্তু এই হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সাহাবিরা হাতের আঙ্গুল থেকে শুরু করে একেবারে কাঁধের সংযোগস্থল পর্যন্ত মাসেহ করেছিলেন।

কেন এই সীমা?

আরবি ভাষায় 'ইয়াদ' (হাত) শব্দটি আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত পুরো বাহুকে বোঝাতে পারে। তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হওয়ার পর, যেখানে কেবল 'হাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সীমানা (যেমন কনুই পর্যন্ত) নির্দিষ্ট করা হয়নি, সেখানে সাহাবিরা সতর্কতাবশত 'হাত' শব্দের সর্বোচ্চ সীমা অর্থাৎ কাঁধ পর্যন্ত আমল করেছিলেন। এটাকে ফিকহের পরিভাষায় 'মুবালাগা ফিল ইবাদাত' বা ইবাদতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন বলা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: যদিও এই হাদিসে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করার কথা আছে, কিন্তু ফকিহদের ইজমা (ঐকমত্য) হলো, পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে এই হুকুম রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে এবং চূড়ান্ত বিধান হলো কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা। আল্লাহ তাআলা অজুর আয়াতে হাতের সীমা 'ইলাল মারাফিক' (কনুই পর্যন্ত) নির্ধারণ করেছেন, তাই তায়াম্মুমেও সেই সীমা প্রযোজ্য হবে।

---

৪. "অতঃপর আমরা হাতের জন্য কাঁধ পর্যন্ত পিঠ ও পেটের দিকে একটি আঘাত করলাম"—বাক্যটির ব্যাখ্যা এবং এর মাধ্যমে মাসেহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করো। (فسر الجملة "ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا" وبين كيفية المسح من خلالها)

উত্তরঃ

হাদিসের এই অংশটি "ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرا وبطنا" সাহাবিদের তায়াম্মুমের পুঙ্খানুপুঙ্খ পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরে। এর ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি নিম্নরূপ:

বাক্যটির ব্যাখ্যা:

- "সুম্মা দরাবনা" (অতঃপর আমরা আঘাত করলাম): এটি চেহারার পর দ্বিতীয় আঘাতের প্রমাণ।
- "লিল ইয়াদাইনি ইলাল মানাকিব" (দুই হাতের কাঁধ পর্যন্ত): অর্থাৎ মাসেহ করার সময় তাঁরা শুধু হাতের তালু বা কনুইতে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং হাতের আঙ্গুল থেকে শুরু করে বগল ও কাঁধ পর্যন্ত পুরো বাহু মাসেহ করেছেন।
- "জহরান ওয়া বাতনান" (পিঠ ও পেট): এখানে 'জহর' মানে হাতের ওপরের অংশ (যা লোমশ হয়) এবং 'বাতন' মানে হাতের ভেতরের অংশ (তালু ও ফোরআর্মের ভেতরের দিক)। অর্থাৎ হাতের কোনো অংশই মাসেহ থেকে বাদ যায়নি।

মাসেহ করার পদ্ধতি:

এই বর্ণনা অনুযায়ী মাসেহ করার পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। সাহাবিরা সম্ভবত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় এটি সম্পাদন করেছিলেন:

১. মাটিতে হাত মেরে ধুলো লাগিয়েছেন।

২. এরপর বাম হাত দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল থেকে শুরু করে ওপরের দিক দিয়ে টেনে একেবারে কাঁধ পর্যন্ত নিয়েছেন।

৩. এরপর ডান হাতের ভেতরের অংশ (বগল সংলগ্ন অংশ থেকে নিচের দিকে) মাসেহ করে হাতের তালু পর্যন্ত এসেছেন।

৪. অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত এবং কাঁধ থেকে আবার তালু পর্যন্ত মাসেহ করেছেন।

তাৎপর্য:

এই পদ্ধতিতে দেখা যায়, তাঁরা মাটিকে পানির মতোই ব্যবহার করেছেন। পানিতে হাত ধুলে যেমন হাতের পিঠ, পেট, ও বগলের নিচের অংশ ভিজে যায়, তাঁরা মাটি দিয়েও ঠিক সেভাবেই পুরো হাত আবৃত করার চেষ্টা করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, বিধানের শুরুতে সাহাবিরা তায়াম্মুমকে অজুর হুবহু প্রতিচ্ছবি মনে করতেন। যদিও পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) জানিয়ে দেন যে, তায়াম্মুম হলো একটি 'রুখসাত' বা সহজ বিধান, তাই এত কষ্ট করে কাঁধ পর্যন্ত ঘঁষার প্রয়োজন নেই, বরং কনুই পর্যন্ত বা কবজি পর্যন্তই যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ

অর্থ: তোমার জন্য চেহারা এবং দুই হাতের তালুই যথেষ্ট। (সহিহ বুখারি)

---

৫. সাহাবির এই উল্লেখ যে "যখন তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো"—এতে উসুল ও ফিকহ শাস্ত্রীয় কী ফায়দা রয়েছে? (ما الفائدة الأصولية والفقهية من ذكر الصحابي لتوقف الحديث حين نزلت أية التيمم ؟)

উত্তর:

হযরত আম্মার (রা.) তাঁর বর্ণনায় "حين نزلت أية التيمم" (যখন তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো) কথাটি যুক্ত করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি কেবল সময়ের উল্লেখ মনে হলেও, উসুল আল-ফিকহ (আইনশাস্ত্রের মূলনীতি) এবং ফিকহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এর গভীর তাৎপর্য ও ফায়দা রয়েছে।

১. নসখ বা রহিতকরণের ইঙ্গিত (ফায়দা উসুলিয়া):

উসুলের নীতি হলো, যদি দুটি হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তারিখ বা সময়কাল জানা জরুরি। যে হাদিসটি আগের, সেটি 'মানসুখ' (রহিত) এবং যেটি পরের, সেটি 'নাসিখ' (রহিতকারী) হতে পারে। আম্মার (রা.) এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করার ঘটনাটি ছিল 'আয়াত নাজিলের ঠিক পরপর'। এর অর্থ হলো, এটি ছিল প্রাথমিক আমল। পরবর্তীতে আম্মার (রা.) নিজেই যখন কনুই বা কবজি পর্যন্ত মাসেহ করার হাদিস বর্ণনা করেছেন, তখন

উসুলের নীতি অনুযায়ী বোঝা যায় যে, কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করার হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। এটি 'তাদাররুজ ফিত-তাশরি' (আইন প্রণয়নের ক্রমবিকাশ) প্রমাণ করে।

২. সাহাবিদের ইজতিহাদের প্রমাণ (ফায়দা ফিকহিয়া):

এই বাক্যাংশটি প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ও সাহাবিরা কুরআনের আয়াতের ওপর ভিত্তি করে 'ইজতিহাদ' (গবেষণা) করতেন। আয়াত নাজিল হলো, তাঁরা 'হাত' শব্দের অর্থ নিজেরা বুঝে আমল শুরু করলেন। পরবর্তীতে নবীজি (সা.) তা সংশোধন করলেন। এটি প্রমাণ করে, ওহির ব্যাখ্যা ছাড়া কেবল শাব্দিক অর্থের ওপর আমল করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. আসবাবুন্ নুজুল (শানে নুজুল):

এই উল্লেখের মাধ্যমে হাদিসটির প্রেক্ষাপট বা 'আসবাবুন নুজুল' জানা যায়। ফিকহি বিধান বোঝার জন্য প্রেক্ষাপট জানা জরুরি। এটি পরিষ্কার করে যে, এই কঠিন পদ্ধতিটি (কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ) ছিল একটি বিশেষ পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, স্থায়ী বিধান নয়।

অতএব, "যখন আয়াত নাজিল হলো" কথাটি ফকিহদের এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে যে, এই হাদিসের ওপর বর্তমানে আমল করা যাবে না, কারণ এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা যা পরবর্তীতে সহজ করা হয়েছে।

---

৬. এই হাদিসের তায়াম্মুমের পদ্ধতি কি পরবর্তী সহিহ হাদিসগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আলেমরা এই পার্থক্যের সমাধান কীভাবে করেছেন? (بين ما إذا كانت صفة التيمم في هذا الحديث تتفق مع الأحاديث الصحيحة الأخرى المتأخرة - وكيف وجه العلماء هذا الاختلاف ؟)

উত্তর:

হযরত আম্মার (রা.) বর্ণিত এই হাদিসে তায়াম্মুমের যে পদ্ধতির (কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ) কথা বলা হয়েছে, তা পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিসগুলোর সাথে বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে

তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো চেহারা এবং হাতের কবজি বা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা। কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করার কথা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদিসে পাওয়া যায় না।

আলেমদের সমাধান (তাবিল ও তাওজিহ):

মুহাদ্দিসিন ও ফকিহগণ এই বিরোধ নিরসনে মূলত তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন:

১. নসখ বা রহিতকরণ (Abrogation):

অধিকাংশ আলেম, বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ি ও হানাফি ফকিহদের মতে, কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করার বিধানটি ছিল ইসলামের শুরুর দিকের। আম্মার (রা.)-এর এই হাদিসটি 'মানসুখ' (রহিত)। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের এই আমল দেখে তাঁদের সংশোধন করে দিয়েছিলেন এবং কনুই বা কবজি পর্যন্ত মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই এখন আর কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করা জায়েজ নয়।

২. সাহাবিদের ইজতিহাদ:

ইবনে আবদিল বার এবং অন্যান্যরা বলেন, কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করাটা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল না, বরং এটি ছিল সাহাবিদের নিজস্ব ইজতিহাদ বা ব্যাখ্যা। তাঁরা আয়াতের 'ফামসাহু বি-আইদিকুম' (তোমাদের হাত মাসেহ করো) শুনে মনে করেছিলেন যে পুরো হাতই মাসেহ করতে হবে। পরবর্তীতে নবীজি (সা.) যখন দেখলেন, তখন তিনি সঠিক পদ্ধতি (কনুই বা কবজি পর্যন্ত) শিখিয়ে দিলেন। সুতরাং, এই হাদিসটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ নয়, বরং সাহাবিদের আমল যা পরে সংশোধিত হয়েছে।

৩. বর্ণনার দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা:

কিছু মুহাদ্দিস এই হাদিসের সনদে থাকা বর্ণনাকারী ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই বর্ণনাটি 'শাজ' (ব্যতিক্রমী)। আম্মার (রা.) থেকেই সহিহ বুখারিতে যে হাদিস এসেছে, তাতে তিনি নিজেই কবজি পর্যন্ত মাসেহ করার কথা বলেছেন। একই রাবি থেকে বিপরীতধর্মী বর্ণনা আসলে সহিহতম বর্ণনাটি গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: আলেমরা একমত যে, এই হাদিসটি তায়াম্মুমের ইতিহাসের একটি অংশ, কিন্তু আমলযোগ্য বিধান নয়। চূড়ান্ত বিধান হলো তায়াম্মুমে কনুই পর্যন্ত (হানাফি মতে) অথবা কবজি পর্যন্ত (অন্য মতে) মাসেহ করা।

---

৭. তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনায় আম্মার (রা.) কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? সাহাবিদের জ্ঞান প্রচারের আগ্রহ সম্পর্কে এটি কী প্রমাণ করে? (ما هو المنهج الذي اتبعه عمار (رض) في عرض صفة التيمم؟ وما الذي يدل على حرص الصحابة على نقل العلم ؟)

উত্তর:

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এক অনন্য ও বাস্তবধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

আম্মার (রা.)-এর পদ্ধতি (মানহাজ):

১. বাস্তব চিত্রায়ন (Practical Demonstration): তিনি কেবল মৌখিকভাবে মাসআলা বলেননি, বরং "ফাদরাবনা" (আমরা আঘাত করলাম) বলে নিজের কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এটি শিক্ষার 'ডেমোনস্ট্রেশন মেথড'। তিনি ঘটনার সাথে নিজেকে যুক্ত করে উত্তম উত্তমরূপে শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

২. সততা ও আমানতদারি: তিনি জানতেন যে চূড়ান্ত বিধান হলো কনুই বা কবজি পর্যন্ত মাসেহ করা। তবুও তিনি ইতিহাসের সত্যতা রক্ষার জন্য শুরুতে তাঁরা যা করেছিলেন (কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ), সেটাও অবিকল বর্ণনা করেছেন। তিনি কোনো তথ্য গোপন করেননি।

সাহাবিদের জ্ঞান প্রচারের আগ্রহ:

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম জ্ঞান বা ইলম প্রচারে কতটা আন্তরিক ও আপসহীন ছিলেন:

- ভুল থেকেও শিক্ষা: তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক ভুল বা ইজতিহাদি আমলগুলোও উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে উম্মত জানতে পারে বিধানটি কীভাবে ধাপে ধাপে এসেছে।

- রাসুলের সান্নিধ্যের বিবরণ: তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সফর এবং প্রতিটি আদেশের প্রেক্ষাপট মুখস্থ রাখতেন এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াকে নিজেদের ইমানি দায়িত্ব মনে করতেন।

- পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা: হাতের 'পিঠ ও পেট' (Zahran wa Batnan) এর মতো সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও তাঁরা বাদ দেননি। এই নিখুঁত বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, দ্বীন সংরক্ষণে তাঁদের সতর্কতা ছিল অতুলনীয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

অর্থ: আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও। (সহিহ বুখারি)

সাহাবিরা এই নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

---

৮. এই হাদিস অনুযায়ী তায়াম্মুমে দুটি আঘাত ওয়াজিব হওয়ার ফিকহি বিধান ব্যাখ্যা করো এবং ফকিহরা এ ব্যাপারে কী বলেছেন? (اشرح الحكم الفقهي لوجوب ضربتين للتيمم كما يدل عليه هذا النص، وماذا قال الفقهاء في العمل به؟)

উত্তর:

আলোচ্য হাদিসে তায়াম্মুমের জন্য স্পষ্টভাবে দুটি আঘাতের (জরব) উল্লেখ রয়েছে: "একটি আঘাত চেহারার জন্য এবং আরেকটি আঘাত হাতের জন্য।" এর ওপর ভিত্তি করে ফিকহি মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ ও বিধান তৈরি হয়েছে।

ফিকহি বিধান:

এই হাদিস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদিসের (যেমন ইবনে ওমরের হাদিস) আলোকে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবে সিদ্ধান্ত হলো: তায়াম্মুমে দুটি আঘাত (দরবাতান) ওয়াজিব।

১. প্রথম আঘাতে চেহারা মাসেহ করতে হবে।

২. দ্বিতীয় আঘাতে দুই হাত (কনুই পর্যন্ত) মাসেহ করতে হবে।

এক আঘাতে উভয়টি করা যথেষ্ট নয় এবং তা সুন্নাহসম্মত হবে না।

ফকিহদের মতামত:

- হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব: তাঁরা এই হাদিসের ওপর আমল করেন। তাঁদের মতে, তায়াম্মুম অজুর স্থলাভিষিক্ত। অজুতে যেহেতু চেহারা ও হাত ধোয়া দুটি ভিন্ন কাজ, তাই তায়াম্মুমেও দুটি ভিন্ন আঘাত প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, হযরত আম্মার (রা.)-এর কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করার অংশটি রহিত হলেও, 'দুই আঘাত' এর বিষয়টি রহিত নয়। কারণ অন্যান্য সাহাবি (যেমন ইবনে ওমর রা.) থেকেও দুই আঘাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। দারা কুতনির হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন:

  التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ

  অর্থ: তায়াম্মুম হলো দুই আঘাত।

- হাম্বলি মাযহাব ও আহলে হাদিস: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং আহলে হাদিস বা সালাফি আলেমগণ বলেন, তায়াম্মুমে এক আঘাতই যথেষ্ট। তাঁরা সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আম্মার (রা.)-এর অন্য হাদিসটি গ্রহণ করেন, যেখানে রাসুল (সা.) এক আঘাতে চেহারা ও হাতের কবজি মাসেহ দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এই হাদিসের (কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ ওয়ালা) পদ্ধতিটি পুরোটাই মানসুখ বা রহিত।

- মালেকি মাযহাব: ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, প্রথম আঘাতটি ফরজ, কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটি সুন্নাহ।

উপসংহার:

যদিও মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ফিকহি সতর্কতার দাবি হলো হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী দুই আঘাতের ওপর আমল করা। কারণ এতে হাদিসের ওপর আমল হয় এবং পবিত্রতা অর্জনে কোনো সংশয় থাকে না। এই হাদিসটি দুই আঘাতের প্রবক্তাদের জন্য একটি শক্তিশালী দলিল।